গল্পের পাতা ২ - " আবার নীরব "

সিদ্ধান্ত তর্কনবীশ

১২ জানুয়ারি ২০২১

বিকেলের ম্লান আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘায়িত হতে হতে বারান্দার ওপর এসে পড়ছে। অলোকরঞ্জন ধীর হাতে ইজেলের ওপরে রাখা বিশাল ক্যানভাসের ওপর তুলি টেনে চলেছেন। ক্যানভাসের ওপর ধীরে ধীরে এক অবয়ব ফুটে উঠছে। এখনো আবছায়া মাত্র, তবু আভাসে বোঝা যাচ্ছে এক গমনোদ্যতা নারী। এক পা আগে বাড়ানো, কিন্তু মুখটা ঘোরানো পেছন দিকে। বোধহয় বিদায় নেবার জন্য। ভঙ্গিটা অনেকটা রাজা রবি ভার্মার বিখ্যাত ছবি শকুন্তলার কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও এটা কোনো আশ্রমের ছবি নয় - ছবির চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নগরের পটভূমিতে চলমান কর্মব্যস্ত জীবনের অসংখ্য ছাপ। এরকম ছবি অলোকরঞ্জন অনেকদিন আঁকেন না। ক্যানভাসের ছবি সাধারণতঃ বড়োলোকের বাইরের ঘরের উৎকর্ষ বাড়ায় বলে তিনি অনেকবছর শুধুই ম্যুরাল এঁকে গেছেন যাতে সবাই তা দেখতে পারে। দেশের ম্যুরাল শিল্পীদের মধ্যে তিনি সুপরিচিত।

ছবির নারী ছাড়াও এই ঘরে আরো একজন নারী রয়েছেন, তাঁর স্ত্রী দেবারতি। ছবির নারীর মুখের আদলে অনেকটা যেন তাঁরই ছাপ, যদিও যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। অলোকরঞ্জন কিন্তু মোটেই দেবারতিকে দেখে আঁকছেন না - তিরিশ বছর একসাথে থাকার পর হয়তো আর দেখার দরকারও নেই। মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি অভিব্যক্তি এতই চেনা যে তাকাবারও কোনো প্রয়োজন নেই। অলোকরঞ্জন তবু মাঝে মাঝেই তুলি থামিয়ে স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। ছবির প্রয়োজনে নয়, যোগাযোগের, হয়তো বা কোনোকিছু বলার জন্য। কারণ তিনি কথা ভালো করে বলতে পারেন না, তার জিহবা এতই আড়ষ্ট যে কোনো কিছু বলতে অনেক সময় লাগে, আর তা ভালো করে বুঝতে গেলে আরো বেশি সময় লাগে। তাই তিনি কথা খুব কমই বলেন, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নয়। তাঁর আবেগ অনুভূতি দুঃখ আনন্দ সব তিনি ঢেলে দেন তাঁর ছবিতে। তাই তারা এত সুন্দর। তাই তারা দর্শককে এত অভিভূত করে।

অলোকরঞ্জন কিন্তু সম্পূর্ণ বধির। আশ্চর্যের কথা হলো এই যে তিনি জন্মাবধি বধির ছিলেন না। বারো বছর পর্যন্ত্য তাঁর কোথাও কোনো সমস্যা ছিল না। স্কুলে ভালো আবৃত্তি করতেন, সুন্দর গান গাইতে পারতেন। পড়াশোনায়ও যথেষ্ট ভালো ছিলেন। কিন্তু সেই বারো বছর বয়সে এক দুঃসপ্ন নেমে আসে তার জীবনে। আজও সেই দিনটির কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে যে দিনটি অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিলো তাঁর জীবনে, ছিনিয়ে নিয়েছিল তার কাছ থেকে তার পুরো ছেলেবেলাটা। সেটা ছুটির দিন ছিল। গ্রামের বন্ধুদের সাথে পাল বেঁধে তিনিও গিয়েছিলেন গ্রামের বাইরের জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের এত গভীরে আর কখনো তাঁরা আসেন নি, আর তাই হয়তো কোনো এক রহস্যের হাতছানিতে গভীর থেকে আরো গভীরে যেতে এক রকমের রোমাঞ্চও অনুভব করছিলেন যাতে কোন ভয়ের বালাই ছিল না। উৎসাহে তাঁর খেয়াল ছিল না যে তিনি দলের অন্য সবার চাইতে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন এমন জায়গায় যেখানে জঙ্গলের ভেতরে কোন মানুষের পদচিহ্ন পর্যন্ত নেই। দুর্ঘটনাটা এমন সময় ঘটে। অরণ্যবাসী শবররা জংলী জন্তুজানোয়ার ধরার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে গভীর গর্ত খুঁড়ে ফাঁদ পেতে তার মুখটা ডালপাতা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখে। এমনি এক গর্তের মধ্যে তিনি হঠাৎ পড়ে যান আর পড়েই জ্ঞান হারান। যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি গ্রামের পাশে মফস্সল শহরের হাসপাতালে পুরো পায়ে প্লাস্টার নিয়ে শুয়ে আছেন।

প্রায় তিনমাস হাসপাতালে থাকবার পর ডাক্তাররা তাঁর বাবাকে বলেন কোলকাতায় বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে কারণ ওই হাসপাতালে রেখে আর কোনো লাভ নেই। ততদিনে পায়ের হাড়ে ইনফেকশন হয়ে গেছে - ডাক্তাররা বলেছিলেন তার নাম নাকি অস্টিওমায়েলিটিস । গ্রামের স্কুলের শিক্ষক বাবার সামর্থ্য না থাকলেও চেষ্টার কিছু ত্রুটি হয় নি। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে অগুন্তি অপারেশন হয়েছিল তাঁর ওই ছোট্ট পায়ে - অসহ্য ব্যাথায় ভরা ওই সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত তাঁর কাছে ছিল বিভীষিকাময়। হাসপাতালের বিছামায় শুয়ে একা একা কাঁদতেন। আরো তিনমাস পরে হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ি এসে শয্যাগত ছিলেন প্রায় দু' বছর। প্রথম প্রথম বন্ধুরা আসত, সান্তনা দিত, বলতো শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে, স্কুলে যেতে পারবে। শিক্ষকরাও আসতেন মাঝে মাঝে। তারপর ধীরে ধীরে যতই বোঝা গেলো যে খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই, ততই তাদের আসা যাওয়াও কমতে থাকলো; পরে এক সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলো। অবশ্য তার আরো একটা কারণও ছিল।

বাড়ি ফিরে আসার মাস তিনেকের মাথায় তিনি লক্ষ্য করেন যে তাঁদের বাড়ির বাইরের ঝাঁকড়া বাবুল গাছটায় পাখিদের ডাক তিনি আর শুনতে পাচ্ছেন না। প্রথমে পাখি তারপর কথা তারপর যে কোনো শব্দই আর তার কানে আসছে না। আবার হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছোটাছুটি হলো অনেক, অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখানো হলো কিন্তু কিছুই হলো না। শুধু বোঝা গেলো যে কানের ভেতরের নার্ভ শুকিয়ে গেছে কিন্তু কেউ বলতে পারল না কেন হয়েছে। সেই তের বছর বয়স থেকেই অলকরঞ্জন নৈশ্যব্দের জগতে বেঁচে আছেন। সেই থেকেই নিস্তব্ধতা তাঁর নিত্যসঙ্গী। এটা খুব স্বাভাবিক যে কেউ তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষন থাকতে চাইবে না।

*****

দীর্ঘ চার বছর অলোকরঞ্জন পুরোপুরি শয্যাশায়ী ছিলেন। বধির হয়ে যাবার পর থেকে আস্তেআস্তে তাঁর কথাবার্তাও কমে যেতে থাকে। শুনতে না পেলে বলার প্রবণতাও কমে যায় - অনেক সময় বলার কিছু খুঁজেও পাওয়া যায় না। নিজের সঙ্গে কথা বলতে তো আর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন নেই। মাকে তিনি হারিয়েছেন অনেক ছোটবেলায় - বাড়িতে বাবা ছাড়া আর কোনো ভাইবোনও নেই যাদের সঙ্গে কথা বলা যায়। বাবা রোজ সন্ধ্যেবেলায় কাছে এসে বসতেন, ক্ষতগুলোতে ওষুধ লাগাতেন, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। মুখে কথাবার্তা হতো না, হতো লিখে। বাবাকে কোনোদিনও আক্ষেপ করতে দেখেন নি। আর বাবা যখন বাইরে থাকতেন তখন একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। বাবা স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এনে দিতেন। ঐটুকু বয়সেই যে কত বই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। যারা এভাবে শুধু বইয়ের জগতে বেঁচে থাকে তাদের বোধহয় রিয়েলিটির সাথে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে - তখন তারা আর রিয়েলিটিতে ফিরে আসতেও চায় না। আলোকরঞ্জনেরও তাই হয়েছিল। তিনি তাঁর নিজের নিভৃত জগতে একান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বেঁচে থাকতে শিখেছিলেন - বাইরের জগতের সাথে একমাত্র যোগসূত্র ছিলেন বাবা। কিন্তু বাবাও তাঁর সেই জগতে কোনো অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা কখনো করেন নি, শুধু ছেলের হাতে আর এক জগতের প্রবেশের চাবিকাঠি ধরিয়ে দিয়েছিলেন - রং আর তুলি। লক্ষ্য করেছিলেন যে ছেলের আঁকার হাত খুব ভালো আর তেমনি ভালো তার কল্পনার চোখ। অলোকরঞ্জনের নিঃসঙ্গ ছোটবেলার কিছুটা তবুও ভরেছিলো রঙে।

বাবা স্কুলের লাইব্রেরি থেকে, কখনো কখনো কোলকাতা থেকেও, ছবির আর চিত্রশিল্পের নানা বই আনিয়ে দিতেন - অলোকরঞ্জন সেগুলো গোগ্রাসে গিলতেন। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত রং আর তুলি নিয়ে। তেল রং বা ক্যানভাস কেনার সামর্থ ছিল না - তাই কাগজের ওপরেই চলত সমস্ত পরীক্ষা আর অভ্যাস। এমনি করে যখন চার বছর পর তিনি ধীরে ধীরে লাঠি ভর দিয়ে চলা শুরু করলেন ততদিনে তার সাথীরা সবাই প্রায় স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন স্কুলের বাইরে থাকার পর ওই স্কুলে ফিরে যেতেও ইচ্ছে মোটেই করছিল না। বাবাও হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই স্কুল আর তার জন্য নয়। সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার সুবাদে অনেক ধরাধরি করে অবশেষে কোলকাতার এক স্কুলে বদলি হয়ে আসেন - উদ্দেশ্য একটাই, ছেলের ভবিষ্যৎ। অলোকরঞ্জন ততদিনে আরো নিজের ভেতরে গুটিয়ে গেছেন - ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছেন ডিপ্রেশনের অতলান্ত গভীরে। কলকাতা তাঁকে সত্যি তখন বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সেটা সত্তরের দশকের শেষভাগ। কলকাতায় তখন বিভিন্ন ধরণের আর্ট - বিশেষ করে চিত্রকলা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, বেশ কয়েকটা আর্ট স্কুলও দেখা দিয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্যালকাটা গ্রুপের দিকপালেরা অবশ্য একে একে বিদায় নিয়েছেন - অবনী সেন, সুনীল মাধব সেন, গোপাল ঘোষ, রামকিঙ্কর - এদের কেউ আর তখন নেই। কিন্তু তাদের প্রভাব রয়ে গেছে শিল্পজগতে পুরোমাত্রায়। এমনি এক বেসরকারী আর্ট স্কুলে বাবা তাকে নিয়ে গেলেন ভর্তি করাতে, কিন্তু স্কুলের গন্ডি না পেরোনো ছাত্রকে কে নেবে? অনেক বলে কয়ে তাদের রাজি করানো হল এই শর্তে যে অলোকরঞ্জন শুধু ক্লাসে কিন্তু অন্য সব ছাত্রদের থেকে আলাদা বসে দেখতে পারবেন কি পড়ানো বা আঁকানো হচ্ছে, কিন্তু তিনি ক্লাসের ছাত্র হতে পারবেন না, পারবেন না ক্লাসে কোনো কথা বলতে বা কিছু জিজ্ঞেস করতে। তাতে তাঁর অসুবিধে নেই - তিনি তো এমনিতে কথা বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। কিন্তু মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই তাঁর এই অবস্থার পরিবর্তন হলো - ততদিনে তাঁর অঙ্কনপ্রতিভা মাস্টারমশাই আর ছাত্রদের নজর কাড়তে শুরু করেছে। ব্রাত্য অবস্থা থেকে তাঁর পদোন্নতি হলো মূল ক্লাসে।

এক ছুটির দিনে বাবা তাঁকে নিয়ে গেলেন চৌরঙ্গি রোডে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফটের বিল্ডিংয়ের সামনে। শোনালেন কলেজের ইতিহাস, যেখান থেকে বেরিয়েছেন অগণিত দিকপাল শিল্পী ভাস্করেরা - নন্দলাল, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সোমনাথ হোড় , রাজেন তরফদার, হেমেন মজুমদার, গনেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী, আরো কত কত শিল্পীরা। পাশেই ভারতীয় জাদুঘর - সেখানে তাদের কিছু কিছু সৃষ্টিও রাখা আছে - সেসব দেখাতে দেখাতে সম্মোহিতপ্রায় ছেলেকে তারপর একটা কথাই বললেন যে সেখানে পড়তে গেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করা চাই এবং সেটা বাড়িতে থেকে স্কুলে না গিয়েও হতে পারে যদি যথেষ্ট মনের জোর থাকে। অলোকরঞ্জনের যাত্রার শুরু এখান থেকে। তিন বছর পরে তিনি প্রবেশ করলেন কলেজের চত্বরে, ছাত্র হিসেবে। আর এখানেই দেবারতি আসেন তার জীবনে, আশীর্বাদ হয়ে।

দেবারতি আর তিনি একই ক্লাসে পড়েন, কিন্তু প্রথমে কেউই বন্ধুত্বের কথা ভাবেন নি । অলোকরঞ্জন তো এমনিতেই সবার সঙ্গ এড়িয়ে চলেন - প্রথমতঃ কানে শুনতে পান না আর তার ওপর কথাও ঠিকমত বলতে পারেন না। বলতে গেলেই বিদ্রুপ আর অবজ্ঞার হাসি শুনতে হয়। তিনি একমনে নিজের আঁকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একদিন তিনি বাইরে বসে একমনে আঁকছিলেন, খেয়াল করেননি যে একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে তাঁর আঁকা লক্ষ্য করছে। ক্লাসে সবাই জানে যে তিনি কানে শুনতে পান না - মেয়েটি তার নোটবুক বের করে তাতে কিছু লিখে পেছন থেকেই হঠাৎ আলোকরঞ্জনের মুখের সামনে এগিয়ে দিলো । তাতে লেখা - তুমি সবসময় এত ডার্ক ছবি আঁকো কেন? তোমার ছবিতে কেন এত আংস্ট এত যন্ত্রণা এত রাগ? কত রং রয়েছে কিন্তু ক্যানভাসে কেন এত কালো আর বেগুনি রঙের ছড়াছড়ি? অথচ তুমি আঁকো এত সুন্দর। অলোকরঞ্জন প্রথমটা খুব চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো জবাব দেন নি। প্রশ্নকারী ছিপ্ছিপে চেহারার শ্যামলা রঙের মেয়েটির দিকে চেয়ে শুধু একটু হেসেছিলেন, সেই হাসিতেও বোধহয় কিছু কম যন্ত্রণা ছিল না। দেবারতি তার পর থেকে যখনই দেখতে পেতেন তিনি কিছু আঁকছেন কাছে এসে বসতেন। ধীরে ধীরে, অনেক দিন কাছে আসতে আসতে একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেন তাঁর যন্ত্রণার কারণ। ততদিনে তার ছবিও একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে - কালোর বদলে হলুদ লাল নীল বিভিন্ন রংয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ক্যানভাসে - ক্রোধের বদলে এসেছে কমনীয়তা, যন্ত্রণার বদলে এসেছে প্রেম আর যৌবনের প্রাণের উল্লাস। উল্লাস এসেছে তাঁর মনেও। ততদিনে দেবারতি হয়ে উঠেছেন বাইরের জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যম - যে ইন্দ্রিয়গুলো তাঁর হারিয়ে গিয়েছিলো তাদেরই পরিপূরক। যে আত্মবিশ্বাস তার তলানিতে এসে ঠেকেছিল অলোকরঞ্জন দেবারতির সাহায্যে তা ধীরে ধীরে ফিরে পেতে লাগলেন। যে বাইরের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে এনেছিলেন, দেবারতিই তাকে শেখালেন আবার সেই জগতের সাথে যোগসূত্র তৈরি করতে - দিতে এবং নিতে। এককথায় দেবারতি তাঁকে আবার জীবনের জোয়ার ভাটায় ফিরিয়ে আনলেন। এবং একটা সময় এলো যখন তিনি বুঝলেন যে দেবারতি ছাড়া তাঁর জীবনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ততদিনে তাঁর উত্তরণ হয়েছে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে - কলাভবনে।

দেবারতি রয়ে গেছেন কলকাতায় - চাকরি খুঁজতে। শুধু শিল্পকলা দিয়ে জীবনধারণ কলকাতায় তখনও অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। একটা স্কুলে আর্ট টিচার হিসেবে ছোট একটা চাকরি জোগাড় করার পর বিয়েতে আর বাধা রইলো না, কারণ দেবারতিদের বাড়ির অবস্থা যথেষ্ট ভালো - কপর্দকহীন চিত্রকারের সাথে বিয়েতে বাবা মা কেউই রাজি ছিলেন না। অতি আড়ম্বরহীন ভাবে মাত্র কয়েকজন ঘুব ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর একসঙ্গে থাকার বেশি সুযোগ হয় নি কারণ তাঁকে শিগগিরই কলাভবনে ফিরে যেতে হয়। এর মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন - পেনশন খুবই সামান্য। বাবা তাই ফিরে গেছেন গ্রামে। কলাভবনের বছরগুলোয় দেবারতিই ছিলেন একমাত্র সম্বল - আর্থিক এবং মানসিক দুদিক দিয়েই। দেবারতির মুখের দিকে চাইলেই অলোকরঞ্জনের সেসব দিনের কথা মনে পড়ে যায় - প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর স্মৃতিপটে ছবির মতো আঁকা রয়েছে বিভিন্ন রঙে, সেগুলোর ঔজ্জ্বল্য মলিন হবার অপেক্ষা রাখে না। যেমন এখন।

আলোকরঞ্জনের তুলি আবার ক্যানভাসের ওপর রেখা আর রঙ টেনে চলেছে - যা ছিল আভাসে এখন তা আরেকটু স্পষ্ট হয়েছে। মেয়েটির সামনে এক ব্যস্ত বিশাল রাজপথ - তাতে চলেছে অসংখ্য গাড়ি - বড় ছোট সবরকমের। রাজপথের উল্টোদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে বহুতলবিশিষ্ট শপিং মল, পাশে একটা বিশাল হাসপাতালের বিল্ডিং - গেটের ওপরে হাসপাতালের নাম নিয়ন লাইটের নীচে জ্বল জ্বল করছে। দেবারতি আর তাঁদের মেয়ে তাকে আগামীকাল সকালে ওই হাসপাতালে নিয়ে যাবে অপারেশনের জন্যে। তাঁর কানের মধ্যে নাকি কি একটা ইমপ্লান্ট বসানো হবে - ডাক্তার অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলেছেন যে অপারেশন করে ওই কোকলিয়ার ইমপ্লান্ট বসালে পরে তিনি আবার তাঁর শ্রবণশক্তির কিছুটা ফিরে পেতেও পারেন। তিনি প্রথমে একেবারেই রাজি ছিলেন না - প্রথমতঃ বিশ্বাসই হয় নি যে এটা সম্ভব, আর তা ছাড়াও যে ইন্দ্রিয় ছাড়াই জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে গেছে, জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে তা দিয়ে আর কিই বা করবেন ? কিন্তু দেবারতির একটা কথায় তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়েছিল - তুমি কি আমার আর তোমার মেয়ের গলা শুনতে চাও না? এর পর আর কোনো যুক্তি অবশ্যই খাটে না।

*****

কলকাতা অলোকরঞ্জনকে তাঁর মনের অন্ধকূপ থেকে বাইরে নিয়ে এসে বাঁচতে শিখিয়েছিল কিন্তু শান্তিনিকেতন তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। শান্তিনিকেতন এসেই তিনি আকৃষ্ট হন ম্যুরাল আর ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি। সেই আগ্রহ ধীরে ধীরে সর্বগ্রাসী হয়ে তার পুরো সত্তাটাকেই আচ্ছন্ন করে তোলে। সত্যি বলতে কি অলোকরঞ্জন তার পরে খুব কমই ক্যানভাসে ছবি এঁকেছেন । ক্যানভাসে আজকের এই ছবিটা তিনি আঁকছেন বহূ বছর পর।

আশির দশকের শুরুতে যখন অলোকরঞ্জন শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন তখন কলাভবনের হিরণ্ময় প্রতিভাবানদের অনেকেই আর ইহজগতে নেই। রামকিঙ্কর বিনোদবিহারী দুজনেই সদ্য প্রয়াত কিন্তু প্রিয় মণিদা, কে জি সুব্রমননিয়ান, রয়েছেন। বিখ্যাত চীনিবটের নিচে তাঁর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলি অলোকরঞ্জনের কাছে এক চিরস্থায়ী অমূল্য স্মৃতি। রামকিঙ্কর বিনোদবিহারী না থাকলেও তাঁদের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বিনোদবিহারী অলোকরঞ্জনকে বেশি আকৃষ্ট করেছিলেন, সম্ভবত তিনিও একইভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে। জন্ম থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ, এবং পরে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কখনও শিল্পকে ছাড়েননি। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধুদের জীবন অবলম্বনে হিন্দি ভবনে তাঁর দুর্দান্ত কোলাজ অলোকরঞ্জনকে সম্মোহিতের মত আকর্ষণ করত, তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ওই ম্যুরালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ম্যুরালগুলি ছাড়াও শান্তিনিকেতনের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের কাজ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ভাস্কর্যের দিকেও। শান্তিনিকেতনে এমন পরিবেশ ছিল যা চিত্রকলা থেকে শুরু করে ভাস্কর্য, কারুকাজ ইত্যাদি সমস্ত শিল্পতেই ছাত্রদের পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করত। আসলে দেখতে শেখাত। মণিদা যেমন বলতেন, প্রতিটি শিল্প শুধু বিভিন্ন ভাবে দেখার পদ্ধতিমাত্র। সত্যি বলতে কি শান্তিনিকেতনে অলোকরঞ্জনের পুনর্জন্ম হয়েছিল। চার বছর পর যখন তিনি কলাভবন ছাড়েন তখন তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং ম্যুরালশিল্পী।

কাজ পেতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি - কারণ কলকাতায় তখন ম্যুরালের কদর বাড়তির দিকে। বামফ্রন্টের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতায় গ্রাফিটি শিল্পের স্বর্ণযুগ, যেখানে শিল্পের সাথে মিশেছিল সামাজিক চেতনা, বিদ্রূপ, ল্যাম্পুনিং, কার্টুন এবং ক্যারিকেচার; তাতে যেমন ছিল রাজনৈতিক বিবৃতি এবং মতবিরোধ, তেমনি ছিল সামাজিক চেতনা, ক্রোধ এবং প্রতিবাদ। তারই সাথে সাথে ম্যুরালশিল্প হয়ে উঠছিলো আশির দশকের সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক যাইটগাইস্টের প্রতীক এবং সোচ্চার ভাষা - তাতে ধরা পড়ছিলো লোডশেডিং, মূল্যবৃদ্ধি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা এবং অনৈতিকতা। শুরুতে অলোকরঞ্জনের উপার্জন খুব বেশি ছিল না এবং দেবরতির আর্ট টিচারের চাকরি সত্ত্বেও কঠিন টানাটানির মধ্যেই অনেকদিন কাটাতে হয়েছিল। তবে অলোকরঞ্জনের প্রতিভা ধীরে ধীরে শিল্প সমালোচকদের নজরে আসতে এবং আলোচিত হতে শুরু করে এবং শুধু শিল্পের মহলেই নয়। দশকের শেষের দিকে, যখন দিল্লি ও বোম্বাইয়ের গ্যালারীওয়ালারা কলকাতায় আসতে শুরু করে এবং গণেশ পাইন এবং বিকাশ ভট্টাচার্যের মতো শিল্পীরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন, তখন কলকাতার প্রায় কোমাটোস আর্ট মার্কেটও হঠাৎই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। নতুন নতুন আর্ট গ্যালারী তৈরী হয় আর দ্রুত তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাথে সাথে অলোকরঞ্জনের খ্যাতি এবং অর্থাগমও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁকে বেশ কয়েকটি ম্যুরাল চিত্রকলার কাজ দেন যা তাঁর খ্যাতি এবং উপার্জন দুটোই বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়। তারপর আসে কর্পোরেটেরা ম্যুরাল দিয়ে তাদের অফিস সাজাতে। অলোকরঞ্জনকে তখন থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

*****

অপারেশন করতে ঘন্টা তিনেক সময় লেগেছিলো। কানের পিছনে ইমপ্লান্ট করা সাউন্ড প্রসেসর আর কানের ভেতরে কোকলিয়াতে ইমপ্লান্ট করা ইলেক্ট্রোডের সাহায্যে এবারে অলোকরঞ্জন প্রায় ছয় দশক পরে কথা শুনতে পাবেন । সার্জন অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কোকলিয়ার ইমপ্লান্ট থেকে প্রাপ্ত সংকেতগুলো বুঝতে কিছু সময় লাগবে - এটা ঠিক সিনেমার মতো নয় যে অপারেশন থেকে জেগে উঠেই তিনি পরিষ্কারভাবে সবার কথা শুনতে ও বুঝতে পারবেন। সংকেতগুলো বুঝতে সময় এবং প্রশিক্ষণ লাগে। ঠিক তাই ই হয়েছিল।

দেবারতিই প্রথম কথা বলেছিলেন - কি গো, কেমন লাগছে তোমার বৌয়ের কথা শুনতে? কি মিষ্টি বলো আমার গলার স্বর? তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি - শুধু কিছু জড়ানো শব্দগুচ্ছ কিন্তু কোনো কথা নয় - তবু শুনতে তো পাচ্ছেন তাই ভীষণ উত্তেজিত এবং উচ্ছসিত হয়েছিলেন। আবার শুনতে পারার প্রাথমিক উচ্ছাসের পরে প্রায় বছর কেটে গেছে - এখন শোনা কথাগুলোকে ধীরে ধীরে আলাদা করে বুঝতে শিখেছেন সত্যি, কিন্তু সেগুলো মোটেই সাধারণ বাক্যালাপের মতো নয়। বুঝতে অনেক সময় লাগে আর অনেক কষ্ট করে বুঝতে হয়। এই এক বছর তিনি হাতে আর তুলি ধরেন নি, এমনকি অপারেশনের আগে সেই যে মেয়েটির ছবি আঁকছিলেন সেটিও অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। হটাৎ স্তব্ধতা থেকে শব্দের জগতে ফিরে এসে অলোকরঞ্জন বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মনের মধ্যে কোনো ছবি আসছে না - আসছে না কোনো বর্ণময় রূপরেখা। যখন কোন কথা শোনার বা বলার থাকে না, তখন বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে বসে থাকেন । দেবারতি লক্ষ্য করেছেন, বারবার কারণ জিজ্ঞেস করেছেন, তাঁকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন, আর তা করতে না পেরে নিজে বারবার মন খারাপ করেছেন। যেমন আজ। শেষে থাকতে না পেরে এসে বসেছেন আলোকরঞ্জনের কাছে। তাঁর হাত তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। তাঁরা অনেকক্ষণ একই ভাবে চুপ করে বসে আছেন।

অন্তহীন সময়ের পারাবার পেরিয়ে অলোকরঞ্জন তাঁর ঘড়ঘড়ে গলায় দেবারতিকে বললেন - জানো, আমি বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি আমি কি চাই, শুনতে না আঁকতে? নিস্তব্ধতার জগতে আমার কাছে রূপ ছিল, রং ছিল, কল্পনা ছিল। তখন আঁকার জন্যে আমাকে সাবজেক্ট ভাবতে হতো না - তারা আপনা থেকেই আমার মনের কাছে ধরা দিত। এখন শব্দের জগতে ফিরে এসে আমি আর তাদের ছুঁতে পারছি না। আমি আবার আমার আগের শব্দহীনতার জগতেই ফিরে যেতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে তা পারব না।

*****

আলোকরঞ্জনের কান থেকে ইমপ্ল্যাটগুলো আবার অপারেশন করে খুলে নেয়া হয়েছে। তিনি ডুবে গেছেন আবার তার শব্দহীন কিন্তু বর্ণময় জগতে। ছবিটাও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। কোলাহলমুখর আধুনিক জগতের রাজপথে পেছন দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটির সামনে একটা গরুর গাড়ি এসে থেমেছে, ব্যাস্ত রাজপথে ধাবমান মোটর গাড়ির মেলে যা অতি বিসদৃশ। কিন্তু মেয়েটি যে নগর থেকে অরণ্যে ফিরে যাচ্ছে । যাবার আগে শেষবারের মত নগরকে, নগরের সবাইকে, বিদায় জানাবে। তারপর আর ফিরবে না।

বাইরে সন্ধ্যা নামছে মন্দ মন্থরে । কোলাহল ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসছে । শান্তি নামছে চরাচরে।

অস্বীকৃতি:
গল্পের কিছু কিছু ঘটনা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সতীশ গুজরালের জীবনের ওপর আধারিত। কিন্তু গুজরাল কখনোই কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন নি।
তথ্যের জন্য রামকিঙ্কর বেইজের জীবন নিয়ে লেখা সমরেশ বসুর উপন্যাস "দেখি নাই ফিরে", শান্তিনিকেতনের শিল্প ইতিহাসবিদ রামন সিভা কুমারের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং " "-এর সাহায্য নিয়েছি ।

(C) Ishan Kotha